একটি অনবদ্য হাঙরশিকার : লেখক বিবেকানন্দ

সুদীপ বসু

কলকাতা থেকে গোলকুন্ডা জাহাজ সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে ২০ জুন ১৮৯৯ পাশ্চাত্যমুখী হয়েছিল। সে-জাহাজের অন্যতম যাত্রী স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে যাত্রাপথের সরস বিবরণ তিনি চিঠিতে পাঠিয়েছিলেন। তারই অল্প অংশ 'হাঙ্গরশিকার'। এই লেখা পড়ে বলতে ইচ্ছে করে, সন্ন্যাসী না হলে তিনি নির্ঘাৎ সাহিত্যিক হতেন। সাহিত্যরসে কলম ডুবিয়ে সাহিত্যিক বিবেকানন্দ এখানে হাজির। ডিটেলের কাজও চমৎকার।

বাংলায় খাঁটি শিকারকাহিনি বেশি নেই। কুমুদনাথ চৌধুরী, হীরালাল দাশগুপ্ত, প্রমদারঞ্জন রায়, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শিবশংকর মিত্র, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ শিকারের গল্প লিখে পাঠক মাতিয়েছেন। এঁরা শিকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জঙ্গলে মাচান বেঁধে চতুষ্পদ শিকার-সহ সুন্দরবনে কুমিরশিকারের গল্প এঁরা শুনিয়েছেন। কাজেই বাস্তবের পটভূমিতে সাহিত্যের রসভাণ্ড প্রাপ্তিতে পাঠকের অসুবিধে হয় না।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের 'হাঙ্গরশিকার' সর্বঅর্থে বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। জাহাজের ডেক থেকে ঝুঁকে পড়ে তিনি সহযাত্রীদের হাঙরশিকার করতে দেখেছেন। গাছে চড়ে কিংবা এক-পা জলে এক-পা ডাঙায় রেখে নয়, জলে ভেসে এই হাঙরশিকারের বিবরণ বাংলা সাহিত্যে আর কেউ দেননি। আরও একটি কথা—শিকার ও শিকারির পারস্পরিক প্রতিহিংসক প্রবৃত্তির উল্লেখ বিবেকানন্দ করেছেন, যার মধ্যে কোথাও আদিম খাদ্যখাদকের মানসিকতা লুকিয়ে আছে। শিকার ও শিকারির ভূমিকাবদল হয়ে যায় স্থলবিশেষে। শিকার হয়ে যায় শিকারি এবং শিকারি হয় শিকার। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এক অমোঘ প্রাকৃতিক সত্যের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। গোড়াতেই তিনি বললেন সাপ আর হাঙরের সঙ্গে মানুষের জন্মশত্রুতা, বলা যায় জাতক্রোধ। বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়ে না। সুতরাং গোলকুন্ডা জাহাজের যাত্রীরা যখন হাঙরশিকারের সুযোগ পেলেন তখন তাঁদের মহা উৎসাহ। বিবেকানন্দ নিজে অবশ্য হাঙরশিকারে অংশ না নিলেও জ্যান্ত হাঙর দেখার সাধ খুব ছিল। সেই ফাঁকে হাঙরশিকার নিজের চোখে দেখলেন। কিন্তু শিকার তো পরে। হাঙরের আগমনবার্তা তার আগে :

''জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত।

সেকেন্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল।"

ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজদর্শন চট করে হয় না। সুতরাং চোখে পড়ল হাঙরের চ্যালাচামুণ্ডাদের। তারাই বা কম কী? বিবেকানন্দ লিখলেন : ''দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মতো এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মতো এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্চা।... তা নয়, ওর নাম বনিটো।... ওর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে।... অত বড় মাছটা তীরের মতো জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে।"

অবশেষে 'প্রকান্ড থ্যাবড়া মাথা' নিয়ে তিনি এলেন গদাইলস্করি চালে, সঙ্গে 'আড়কাঠি মাছ' আর 'হাঙ্গর-চোষক'। এ যেন মহারাজের আগমন! জাহাজের সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী এক ফৌজি আদমি হাঙরশিকারের এই সুবর্ণসুযোগ ছাড়ার পাত্র নয়। তার পিঠ চাপড়াবার লোকও ইতিমধ্যে জুটে গেছে। সে 'বড়ই উৎসাহে' জোগাড়যন্তরে লেগে পড়ল। শুরু হয়ে গেল উদ্যোগপর্ব। সে-ব্যক্তি জাহাজ ঢুঁড়ে 'ভীষণ বঁড়শি'র ব্যবস্থা করলে। সেটা আবার 'কুয়োর ঘটি তোলার ঠাকুরদাদা'। ''তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর ফাতনা-শুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হল।" টোপের যে-বিবরণ বিবেকানন্দ দিয়েছেন সেটা দেখে হাঙরের জিভে জল আসা স্বাভাবিক। তাঁর রীতিমতো ঠাট্টা : ''আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে।"

সর্বনাশ! এ-লেখা পড়ে তো ভক্ত হিঁদু বিলক্ষণ চমকে যাবেন, চটে উঠবেন তারও বেশি! গোঁড়া ভক্তদের চটিয়ে বিবেকানন্দ বহুবার গাল খেয়েছেন। এ-লেখা কি সেই মানুষদের নজর এড়িয়ে গেল?

রাক্ষুসে বঁড়শি এবং ফাতনার আয়োজন তো হল। কিন্তু হাঙরের কাছাকাছি সেটা পৌঁছানো চাই। জাহাজ থেকে অতদূরে ফাতনা ঠেলা যাচ্ছে না। উপায়ও বেরোল। সুয়েজ বন্দরে গোলকুন্ডা জাহাজ কোয়ারান্টাইন হয়েছিল। কোনও যাত্রী পাছে লুকিয়ে নেমে পড়ে তাই জাহাজ পাহারা দেবার নামে নৌকায় দুজন পুলিসপুঙ্গব 'দিব্বি ঘুমুচ্ছিল' (বিবেকানন্দ সহাস্যে যোগ করেছেন, 'আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল')। এইবার ফাতনাটিকে দূরে ঠেলে দেবার জন্যে যাত্রীদের চিৎকারে সচমকে ঘুমভাঙা পুলিসমশাই ''আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে... দূরে ফেললেন।" কিন্তু হাঙর কোথায়? বিবেকানন্দ ছদ্মদুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : 'সখি শ্যাম না এলো'। পরক্ষণেই খুশির খবর। 'ঐ হাঙ্গর, ঐ হাঙ্গর'।

এর পরের অংশ যেন চিত্রনাট্য। কীভাবে হাঙরনন্দন বঁড়শি গিললেন, কীভাবে প্রাণভয়ে সেটি উদ্গার করে পালালেন, নতুন হাঙর কেমন করে শিকার করা হল তা পুরো ছবি হয়ে আছে। এই দুইয়ের মাঝে (হাইফেনের মতো) বিবেকানন্দের স্বাদু রসিকতা হাঙরদের নিয়ে। 'বাঘা' ('বাঘের মতো কালো কালো ডোরাকাটা' বলে স্বামীজী ওই নাম দিয়েছেন) হাঙর পালানোর পরেই

রঙ্গমঞ্চে 'থ্যাবড়ামুখো' হাঙরের প্রবেশ। অতঃপর বিবেকানন্দীয় সরস ভাষণ : ''আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কতরকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে'—বলে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ-মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন-না-কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়?—অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাবড়া'কে আসল খবর কিছু না বলে মুচ্‌কে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' বলে সরে গেল।—'আমি একাই ঠকবো?' ''

এইবার সত্যিসত্যি হাঙরশিকার। তার অসামান্য বর্ণনা ব্যাখ্যাতীত। জাহাজের প্রতিটা মানুষের সশব্দ প্রতিক্রিয়া পড়তে পড়তে পাঠক অনায়াসে গোলকুন্ডার সওয়ারি হয়ে যায়। হাঙরের টোপ গেলা, গলায় বঁড়শি আটকানো, টেনেটুনে জাহাজে তোলা, ফৌজির হাতের কড়িকাঠের 'দুম্ দুম্' আঘাতে হাঙরের মৃত্যু, 'ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্ন-হৃদয়' হাঙরের ঠকঠকিয়ে কাঁপা, তা দেখে মেয়েদের আর্তনাদ (বিবেকানন্দ যোগ করেছেন, 'অথচ দেখতেও ছাড়বে না'। নারীবাদীরা এই মন্তব্য পড়ে খুশি হবেন কি না কে জানে!), হাঙরের পেটচেরা, সেখান থেকে অস্থি-চর্ম-মাংস-কাঠকুটরো পাওয়া, জাহাজের ডেকে রক্তনদী বয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনার পর 'সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।' বিবেকানন্দ অবশ্য ব্র্যাকেটে বলতে পারতেন জাহাজের সহযাত্রীরা পরমানন্দে হাঙরভক্ষণ করেছেন কি না!

বিবেকানন্দের কলমে হাঙরশিকারের এই বর্ণনা সব মিলিয়ে চার বা সাড়ে চার পাতার বেশি নয়। কিন্তু এত অল্প জায়গায় পুরোটা ধরিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি তাঁর কলমে ছিল। বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণে তাঁর প্রয়াস আজ ইতিহাস হয়ে আছে। সে-ভাষার চরিত্র কেমন হওয়া উচিত, বিবেকানন্দ স্বয়ং তা দেখিয়ে দিলেন ১৩০৫-এর উদ্বোধন পত্রিকার দশম সংখ্যায় 'ভাববার কথা', পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (পরে যেটি পরিব্রাজক গ্রন্থ, যার অন্তর্ভুক্ত হাঙ্গরশিকার), উদ্বোধন ১৩০৬-এর ষষ্ঠ সংখ্যায় পত্রপ্রবন্ধ 'বাংলা ভাষা', ১৩০৭-এর দ্বিতীয় সংখ্যার উদ্বোধন-এ প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এ। ভাষাব্যবহারে তিনি মধ্যপন্থী নন। তাই চলিত ভাষার প্রবল জীবনীশক্তি তাঁর নিজের লেখাতেই। তাঁর কথায়—'ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত—মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা করো—আবার যে-কে-সেই—এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'' হাঙ্গরশিকার পড়লে তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

এই লেখা কিংবা পুরো পরিব্রাজক গ্রন্থটি না পড়লে সুধী পাঠক বুঝতেই পারবেন না তিনি কী হারাইলেন।